বড় আকারের রুই জাতীয় মাছ উৎপাদন কৌশল
Large Size Carp Fish Production Technique

বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে রাজশাহী এলাকায় বড় আকারের রুই জাতীয় মাছ উৎপাদিত হচ্ছে, যা দেশের বড় বড় শহরের বাজারসমূহে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন উপজেলা বিশেষ করে রাজশাহী জেলার পবা, পুটিয়া, দূর্গাপুর, মোহনপুর; নাটোর জেলার সিংড়া, গুরুদাশপুর, বড়ায়গ্রাম, লালপুর এবং সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া, তাড়াশ ও রায়গঞ্জে এ ধরনের বড় আকারের কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। রাজশাহী বিভাগের অন্যান্য অঞ্চলেও স্বল্প পরিসরে হোলেও এ পদ্ধতিতে মাছচাষ শুরু হয়েছে। উৎপাদিত এ ধরনের বৃহৎ আকারের (৪-২০ কেজি) মাছ জীবন্ত অবস্থায় রাজধানি ঢাকার বজারসহ দেশের অন্যান্য বৃহৎ শহরগুলোতে পৌছে যাচ্ছে। বড় আকারের মাছের চাহিদা সারা বছরই একই রকম থাকে এবং এর বাজার মূল্যও খুব বেশি উঠা নামা করে না। ফলে প্রতি দিন ২০০-২৫০ ট্রাক মাছ যমুনা সেতু পার হয়ে দেশের ভিবিন্ন শহরে পৌছে যাচ্ছে। বড় আকারের মাছ উৎপাদনের এ কৌশল এ অঞ্চলে মাছচাষে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। পুকুরে কার্পজাতীয় মাছের মিশ্রচাষের এ বিশেষ পদ্ধতিটি এলাকা ভিত্তিক নানা মাত্রায় নানাভাবে প্রয়োগ হচ্ছে এবং চাষ পদ্ধতিতে কিছু ভুল ভ্রান্তিও চর্চার মধ্যে প্রবেশ করেছে বলে আমাদের প্রতিয়মান হয়। এ পদ্ধতিতে মাছচাষ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান তথ্যগত ঘাটতি পুরণসহ একটি সমন্বিত ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য এবং সঠিক ধারণা সকলের কাছে পৌছে দেবার জন্য আমাদের আজকের এ প্রচেস্টা। আশা করি নতুন আগ্রহী মাছচাষি এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সম্প্রসারণ কর্মীরা বড় আকারের রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন কৌশলের বিষয়ে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

কার্প মিশ্রচাষ

বিভিন্ন প্রজাতির কার্প জাতীয় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ (Indian Major Carp & Chinese Carp) একয় পুকুরে একত্রে প্রাকৃতিক ও সম্পূরক খাবার ব্যবহারকরে যে চাষ করা হয় তাহায় কার্প মিশ্রচাষ হিসাবে পরিচিত। এ পদ্ধতিতে যখন বড় আকারের (০২ কেজি হতে ১০ কেজি বা এর চেয়েও বড়) মাছ উৎপাদন করা হয় তখন অনেকে এ পদ্ধতিকে কার্প মোট-তাজাকরণ বা কার্প ফ্যাটেনিং বলে থাকেন। রাজশাহী অঞ্চলে উৎপাদিত এ বড় আকারের মাছ সারাদেশে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বড় আকারের এ মাছ বেশি পরিমাণে উৎপাদন করলেও বিক্রয় করতে কোন সমস্যা হয় না। কার্পজাতীয় মিশ্রচাষের সাথে সাথি ফসল হিসেবে প্রচুর পরিমাণে ফলি ও চিতল মাছও উৎপাদিত হয়। বর্তমানে অনেকেই এ মাছের সাথে একত্রে শিং-মাগুর, পাবদা, গুলশা ও ট্যাংরা চাষ শুরু করে অধিক লাভ নিশ্চিত করছেন।

ছবিঃ মিশ্র চাষের পুকুরে উৎপাদিত বড় আকারের মাছ

কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষের সুবিধা

১) স্তর ভিত্তিক পোনামাছ মজুদের ফলে পুকুরের সকল স্তরের খাদ্য সর্বোত্তম ব্যবহার করা যায়;
২) সিলভার কার্প মজুদের মাধ্যমে ফাইটোপ্লাংটনের প্রাচুর্যতা (অ্যালগাল ব্লুম) নিয়ন্ত্রণ করা যায়;
৩) গ্রাসকার্প জলজ উদ্ভিদ (তন্তু জাতীয়) নিয়ন্ত্রণ করে পাশাপাশি এ মাছের মল কার্পের খাদ্য ও সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়;
৪) তলবাসী মাছ মৃগেল, কমনকার্প, মিরর কার্প কাদায় খাদ্য খোঁজে খায় এর ফলে তলদেশের পুষ্টি পানিতে মিশ্রিত হয়, তলদেশের গ্যাস দূর করে এবং
৫) পুকুরের শামুক নিয়ন্ত্রণে ব্লাককার্প মজুদ করা হয় এবং
৬) একয় সাথে বেশ কয়েক প্রজাতির মাছ এক সাথে চাষ করার ফলে পুকুরে সর্বোত্তম উৎপাদন পাওয়া যায়।

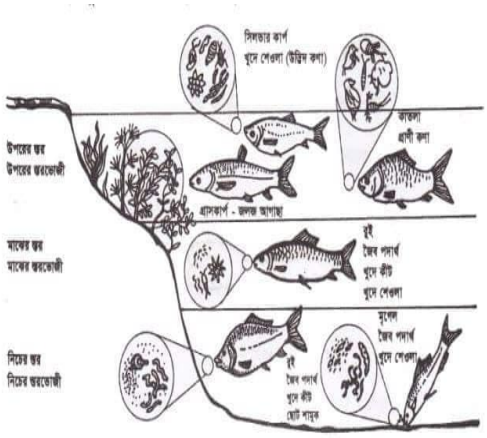

চিত্রঃ পুকুরের বিভিন্ন স্তর

মাছচাষ ব্যাবিস্থাপনা

মাছচাষের জন্য পুকুর নির্বাচন থেকে শুরু করে মাছ বাজারে বিক্রয় পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হয় যার সমস্টিকে এক কথায় মাছচাষ (Aquaculture) বলে। এসকল কার্যক্রমকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ক) মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপ না খ) মজুদ কালিন ব্যবস্থাপনা এবং গ) মজুদ পরবর্তি ব্যবস্থাপনা

ক) মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা

পুকুর নির্বাচন ঃ যে কান পুকুরে এ ধরনের মাছচাষ করা সম্ভব নয়। যেহেতু বড় আকারের মাছ উৎপাদন করা হয় সে জন্য বড় আকারের (২-১০ একর) গভীর (৫-১০ ফুট) পুকুরের প্রয়োজন। বণ্যা মুক্ত মজবুত পাড়যুক্ত রৌদ্রউজ্জল পুকুর এপদ্ধতিতে মাছচাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। মাছচাষের উপকরণ ও মাছ সহজে পরিবহনের জন্য পুকুরটির যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হতে হবে।

ছবিঃ চাষ উপযোগী পুকুর

১) পুকুর প্রস্তুতি ঃ ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে পুকুর প্রস্তুতি শুরু করতে হয়। আগের অধ্যায়ে আলোচিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত পুকুরটি মাছাচাষের উপযোগী করার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। তবে সব সময় একয়ভাবে প্রস্তুত করা যায় না কারণ এখানে বড় আকারের পুকর ব্যবহারকরা হয় যা স্বেচ দিয়ে তৈরি করা যায় না বা সব সময় শুকানো যায় না। ফলে মাছচাষ চলাকালে বিশেষ কিছু সমস্যার সম্মূখিন হতে হয় তা প্রতিরোধের জন্য নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হয়।

২) মজুদের জন্য পোনা নির্বাচন ঃ এ পদ্ধতিতে মাছচাষের জন্য রুই জাতীয মাছের নুন্যতম ২৫০ গ্রাম থেকে ২ কেজি আকারের মাছে প্রয়োজন হয় অনেক সময় এর চেয়েও বড় পোনা পুকুরে মজুদ করা হয় অধিকতর বড় আকারের মাছ উৎপাদনের জন্য। এ পদ্ধতিতে সাধারণত রুই ও কাতল মাছের পোনা তুলনামূলক বেশি লাগে। বাজারসমূহে রুই ও কাতল মাছের চাহিদাও বেশি দামও বেশি এ জন্য মাছচাষিরা এ পদ্ধতিতে রুই-কাতল মাছ যাতে বেশি চাষ করতে পারেন সে জন্য বিশেষ যত্নবান থাকেন। এ পদ্ধতিতে সাধারণত তলদেশের মাছ (মৃগেল, কার্পিও, কালিবাউশ) তুলনামূলক কম চাষ করা হয় যা সাধারণ রুই জাতীয মাছের মিশ্রচাষের অনেকটা বিপরিত। এ মিশ্রচাষ পদ্ধতি ব্যবহৃত পোনা অবশ্যই ভাল মানের হতে হবে।

৩) পোনা সংগ্রহ ঃ এপদ্ধতির চাষে ব্যবস্থাপনায় যেহেতু বড় আকারের পোনা লাগে এ জন্য পোনা সংগ্রহে খরচ বেশি। বিশেষ করে বড়পুকুরে চাষ করা হয় বলে পোনার পরিমাণও বেশি লাগে। বড় আকারের মাছ উৎপাদন করা হয় বলে পোনার গুণগত মান অবশ্যই ভাল হতে হবে। অন্যথায় ভাল ফলাফল পাওয়া যায় না। এজন্য পোনা সংগ্রহে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যদি সম্ভব হয় প্রাকৃতিক উৎসের পোনা সংগ্রহ করে নিজের পুকুরে চাষ করে উপযুক্ত আকারের পোনা তৈরি করে নিতে হবে। যদি প্রাকৃতিক উৎসের পোনা না পাওয়া যায় তা হলে অবশ্যই ভাল মানের হ্যাচারি বা উৎস হতে পোনা সংগ্রহ করতে হবে। রাজশাহী অঞ্চলে অবশ্য এক ধরনের চাষি গড়ে উঠেছে যারা কেবল এ ধরনের পোনা উৎপাদন করে বড় খামারীদের নিকট বিক্রয় করেন। অবশ্য অভিজ্ঞ চাষিরা নিজের চাহিদা মত পোনা নিজের পুকুরে উৎপাদন ও মজুদ রাখেন। অনেক সময় আংশিক আহরণের পর পোনা পুনরায় মজুদ করা হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য নিজের পুকুরে পোনা মজুদ রাখাটায় উত্তম।

ছবি ঃ বড় আকারের পোনা

৪) পোনা মজুদ হার ঃ এ পদ্ধতির মাছচাষে পোনা মজুদের পরিমাণ বা মজুদ ঘনত্ব খুবই গুরুত্ব বহন করে। অনেক চাষি দির্ঘ দিন এ পদ্ধতিতে মাছচাষ করে নিজস্ব একটি মজুদ ঘনত্ব ঠিক করে নিয়েছেন। পোনা কি পরিমাণে ছাড়তে হবে তা নির্ভর করে কত বড় আকারের মাছ উৎপাদন করতে চায় তার উপর। রাজশাহী অঞ্চলে প্রচলিত চাষ পদ্ধতি অনুযায়ী নিম্নে ১০ বিঘা পুকুরে কি পরিমাণ মাছের পোনা মজুদ করতে হবে তার কয়েকটি নমুনা নিন্মে উল্লেখ করা হল ঃ

মাছের প্রজাতি	উৎপাদিত মাছের আকার ও মজুদতব্য পোনার আকার			
	২-৩ কেজি	৪-৫ কেজি	৬-১০ কেজি	< ১০ কেজি
	পোনার আকার ২৫০-৫০০ গ্রাম	পোনার আকার ৭০০ গ্রাম-১.০ কেজি	পোনার আকার ১.০-২.০ কেজি	পোনার আকার ৩.০-৪.০ কেজি
রুই	১৮০০	১২০০	৯০০	৬০০
কাতল	৭০০	৪০০	৩৫০	২৫০
সিলভার	৭০	১০০	৩০	২০
বিগহেড	৭০	৫০	৩০	২০
মৃগেল	৮০০	২০০	১৫০	১০০
গ্রাসকার্প	৭০	৫০	৩০	২০
ব্লাককার্প	৭০	৫০	৩০	২০
মোট পোনা	৩৫৮০	২০৫০	১৫২০	১০৩০

বড় পুকুরে মাছচাষ করার কারণে এ সকল পুকুরে প্রচুর গুড়া মাছ হয় যা মাছের খাদ্যে ভাগ বসায় এবং অক্সিজেন ঘাটতির সৃষ্টি করে। এ সব মাছের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বাড়তি উৎপাদন পাবার জন্য উপরে উল্লেখিত মাছের সাথে কিছু চিতল মাছের পোনা বা ফলি মাছ ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। এ সব মাছের বাজার দর অনেক বেশি, মূল চাষের মাছের পাশাপাশি এ মাছ থেকে একটি ভাল উৎপাদন পাওয়া যায়।

ফলি মাছ

চিতল মাছ

৫) পোনা পরিবহন ঃ যেহেতু পুকুরে বড় আকারের পোনা মজুদ করতে হয় সে জন্য এক্ষেত্রে পোনা পরিবহন বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। পোনা পরিবহনের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

১) কাছাকাছি উৎস থেকে পোনা সংগ্রহ করতে হবে
৩) পরিবহনের আগের দিন খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে
৫) দূর থেকে পরিবহনের সময় পরিবহন ট্যাংকের পানির সাথে স্যালাইন মিশিয়ে নেয়া যেতে পারে

২) পোনা পরিবহনের সময় এ্যারেশন নিশ্চিত করতে হবে
৪) পরিবহনের আগে ভালভাবে কন্ডিশনিং করে নিতে হবে
৬) অথবা পরিবহন ট্যাংকের পানিতে ভিটামিন সি বা প্যানভিট একুয়া মিশিয়ে নেয়া যেতে পারে

৬) পুকুরে পোঁকা মারার ঔষধ প্রয়োগ ঃ পুকরে পোনা মজুদের আগের দিন পুকুরে বিদ্যমান পোঁকা মাকড় বা বড় আকারের জুপ্লাংকটন মারার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। রিবকর্ড বা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের যে কোন একটি ঔষধ বিঘাতে ৫০-৭০ এমএল প্রয়োগ করতে হবে। পোঁকা-মাকড় মজুদকৃত মাছের নানাভাবে ক্ষতি করে থাকে, মাছের শরীরে আক্রমণ করে মাছকে অস্বস্তিতে ফেলে পিড়ন অবস্থায় সম্মুখিন করে। অনেক সময় মাছে রোগের সৃষ্টি করে মৃত্যুহার বৃদ্ধি করে।

বিঃদ্রঃ বড় বাকারের মাছচাষে ৫০০ গ্রামের বড় আকারের মাছ ছাড়া হয় যেমন ধরে নেয়া যাক এক একরে মোট মাছ ছাড়া হয় ১০০০টি যার ওজন প্রায় ৫০০ কেজি, যার ক্রয় মূল্য পড়ে ১৫০/– টাকা দরে মোট ৭৫,০০০/- টাকা। এখানে একটি বিষয় অনেকে বুঝতে চাইনা যে এই মাছ ৬ মাস বা এক বছর পরে যখন বিক্রয় করা হয় তখন এই ৫০০ কেজি মাছ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ কেজি বা আরো বেশি হয়ে যায়। এ সময় গড়ে মাছের ওজন ২-৪ কেজি হয় যার বাজারে বিক্রয় মূল্য ৩০০-৪০০/- টাকা প্রতি কেজি। এখানে ক্রয় করা ৫০০ কেজি মাছ এই ২০০০ কেজি মাছের মধ্যেয় আছে যার বিক্রয় মূল্য বেড়ে ১,৫০,০০০/- হতে ২,০০,০০০/- টাকা হয়ে গেছে। খুব মজার বিষয় হলো এ ৫০০ কেজি এর পিছনে কোন খাবার খরচ না করেই প্রায় লক্ষাধিক টাকা বাড়তি আয় হচ্ছে। এখানেই বড় আকারের মাছচাষের গুড় রহস্য।

খ) মজুদ কালিন ব্যবস্থাপনা

১) পোনা শোধন ঃ পোনা জালদিয়ে ধরা, পরিবহন গাড়িগে উঠাতে ও পরিবহনের সময় পোনার পাখনা ভেঙ্গে যেতে পারে কিছু আইশঁ উঠে যেতে পারে। যেখানে পরবর্তিতে ইনফেকশন হয়ে পোনার মৃত্যুহার বেড়ে যেতে পারে, পোনার বৃদ্ধিহার কমে যেতে পারে। এ জন্য পোনা মজুদের আগে পোনা পটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট দিয়ে শোধন করতে হবে। পোনা পুকুর পাড়ে আসার আগে একটি পাত্রে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পটাশ গুলিয়ে রাখতে হবে। পরিবহন ট্যাংকে সরাসরি পটাশের দানা না দিয়ে গুলানো পটাশ দিতে হবে। এ কাজটি লবণ (NaCl) দিয়েও করা যেতে পারে।

২) পোনা খাপখাওয়ানো (Acclimatization) ঃ পুকুরে পোনা মজুদের আগে পোনা শোধনের পাশাপাশি পুকুরের পানির সাথে খাপখাওয়াতে হবে। হঠাৎ নতুন পরিবেশে (যেখানে তাপমাত্রা, পিএইচ, অক্সিজেন এর মাত্রা একই রকম নয়) পোনা অবমুক্ত করলে পোনা শক বা পিড়ন (Stress) এর সম্মূখিন হতে পারে। এর ফলে পোনার নানাবিধ ক্ষতি হতে পারে যেমন পোনার বর্দন হার কমে যেতে পারে।

৩) পোনা পর্যবেক্ষণ ঃ পোনা ছাড়ার পরের দিন ভোরে পুকুরের চারিদিকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে কোন পোনা মারা গেছে কিনা বা দূর্বল হয়ে ঘুরছে কিনা। দু-একটি পোনা মারা গেলে তা উৎপাদনে তেমন প্রভাব ফেলবে না তবে বেশি সংক্ষ্যক (৫০-১০০) পোনা মারা গেলে অবশ্যই প্রজাতি ভিত্তিক সে পরিমাণ পোনা পুনরায় মজুদ করে দিতে হবে।

গ) পোনা মজুদের পরে করণীয় কার্যক্রম

১) মাছের খাদ্য প্রদান ঃ পুকুরে পোনা মজুদের পরের দিন হতে নিয়মিত খাবার দিতে হবে। মাছের মোট ওজনের ৩-৪% হারে প্রতি দিন খাবার দিতে হবে। কার্পজাতীয় মাছের খাদ্যে ২২-২৫% আমিষ থাকা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি চর্চা হয়ে আসছে। পুকুরে মাছের বৃদ্ধি ভাল পাবার জন্য প্রতিদিন দুইবার (সকাল-বিকাল) মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। সকাল ৯-১০ ঘটিকার মধ্যে একবার এবং বিকাল ৪-৫ ঘটিকার মধ্যে আর একবার। তবে দিনে একবার ডুবন্ত খাবার দিয়েও মাছচাষ করা যেতে পারে। ডুবন্ত খাবার দুই রকম হতে পারে। ক) বাজারের পিলেট খাবার এবং খ) পুকুরের পাড়ে তৈরি ভিজা খাবার। ভিজা খাবার নানা উপকরণ মিশ্রণে তৈরি করা হয়ে থাকে যার কয়েকটি ধরন নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১০০ কেজি খাবার তৈরিতে ভিভিন্ন উপকরণের পরিমাণ (কেজিতে)

উপকরণের নাম	ধরন-১	ধরন-২	ধরন-৩	ধরন-৪	ধরন-৫	ধরন-৬
১) সরিষার খৈল	২০	২০	৩০	**৩০**	**২৫**	**১৫**
২) গমের ভূষি	২০					
৩) অটোকুড়া	৩০	৫৫		**৭০**	**৩০**	
৪) ভূট্টা চূর্ণ	১০					
৫) ডিওআরবি	১০		৪৫		**১৫**	
৬) ক্ষুদ সিদ্ধ					**৩০**	**৬০**
৮) শুটকির গুড়া	১০					
৯) বাজারের পিলেট খাবার		২৫	২৫			**২৫**

২) খাবার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ সমস্ত খাবার নির্ধারিত কয়েকটি স্থানে দিতে হবে। খাবার প্রদানের ১ ঘন্টা পরে খাবার অবশিস্ট আছে কিনা পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী খাবার বাড়াতে বা কমাতে হবে। খাবারের প্রতি মাছের আচারণও পর্যবেক্ষণ করতে হয়। অতিরিক্ত খাবার পঁচে পুকুরের পরিবেশই নস্ট করে না অর্থেরও অপচয় হয়।

৩) খাদ্য দানিতে (Feed Tray) ঃ মাছের খাবার গ্রহণের হার পর্যবেক্ষণ করার জন্য বড় মাছ উৎপাদন কারীরা সাধারণত পুকুরে খাদ্য দানিতে খাবার প্রয়োগ করে থাকেন। পুকুরে বিঘা প্রতি নুন্যতম একটি খাদ্য দানি স্থাপন করতে হবে। খাদ্য দানিতে খাবার দিলে মাছ সমস্ত খাবার খেয়েছে কিনা পর্যবেক্ষণ করা যায়। খাদ্যের অপচয় রোধ করা যেতে পারে। খাদ্য দানিতে খাবার দিলে রুই মাছের জন্য সবচেয়ে ভাল হয়। খাদ্য পুকুরের তলায় চলে গেলে সাধারণত সে খাবার মৃগেল ও কার্পিও মাছে সহজে খেতে পারে কিন্তু রুই মাছের নাগালের বাহিরে চলে যায়। অনেক চাষির মতে এভাবে খাবার দিলে কাতলের জন্যও সুবিধা হয়। খাদ্য দানিতে খাবার দেবার জন্য এ অঞ্চলের চাষিরা সিমেন্টের চাড়ির নৌকা ব্যবহারকরে থাকেন, যা দেশের অন্য কোথাও দেখা যায় না।

ছবিঃ খালি বতোল দিয়ে ভাসমান ফিডট্রে

৪) বস্তায় খাবার ঝুলিয়ে দেয়া ঃ বানানো ভিজা খাবার বা ডুবন্ত পিলেট খাবার অনেকে বস্তার মধ্যে ভরে বাশের খুটির সাথে বা আড়ার সাথে ঝুলিয়ে দিয়ে থাকেন। খাবারের বস্তার চারিদিকে ছোট ছিদ্র করে দেয়া হয়। এভাবে খাবার দিলেও খাবার গ্রহণের পরিমাণ বা খাবার শেষ করার সময় সহজে পর্যবেক্ষণ করা যায়। বস্তার খাবার ৩-৪ ঘন্টার মাঝে ফুয়িয়ে যায় কিনা দেখতে হবে।

ছবি ঃ ক্ষুদ সিদ্ধ করার পাত্র এবং খাদ্য প্রদানে ব্যবহৃত চাড়ি

ছবি ঃ বাঁশের আড়ায় বস্তায় করে খাদ্য ঝুলিয়ে দেয়া

৫) ভাসমান খাদ্য প্রদান ঃ মাছের দ্রুত বর্ধন বা বিশেষ করে রুই মাছের ভাল উৎপাদন পাবার জন্য পুকুরে ডুবন্ত খাবার দেবার পাশিাপাশি বিকাল ৪-৫ ঘটিকার মধ্যে মোট খাবারের অর্ধেক ভাসমান খাবার দিতে হয়। বাজারে বিভিন্ন কম্পানির ভালমানের খাবার পাওয়া যায়। ভাসমান খাবার দেবার জন্য পুকুরের ৩-৪ স্থানে ভাসমান নেট বৃত্তাকার বা আয়তকারভাবে স্থাপন করে তার মধ্যে খাবার দেয়া হয় যাতে খাবার সারা পুকুরে ছড়িয়ে না যায়। পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের সময় অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা করে থাকে যা এ ধরনের ঘের তৈরি করে প্রতিরোধ করা যায়। আকবার মাছের ভাসমান খাবার সারা পুকুরে ছড়িয়ে গেলে মাছের খাদ্য গ্রহণে অনেক শক্তি ব্যায় হয় এবং খাদ্য অপচয় হতে পারে।

ছবি ঃ পুকুরে ভাসমান খাবার প্রদানের ঘের

৬) খাদ্য প্রয়োগে সতর্কতা ঃ খাদ্য প্রয়োগের সময় কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয় যা নিম্নে উল্লেখ করা হল

- ❖ প্রয়োজনের অধিক খাবার দেয়া যাবে না;
- ❖ নিয়মিত এবং পরিমাণমত খাবার দিতে হবে;
- ❖ নির্ধারিত স্থানে প্রতিদিন খাবার দিতে হবে;
- ❖ আবহাওয়া ঠান্ডা বা ঝির ঝির বৃষ্টি বা মেঘলা হলে খাবার কম দিতে হবে;
- ❖ পুকুরে প্রাকৃতিক খাবার বেশি থাকলে খাবার কমিয়ে দিতে হবে;
- ❖ খাদ্য উপকরণ ২-৩ দিন ভিজিয়ে রেখে পুকুরে প্রয়োগ করা ঠিক নয়;
- ❖ গোবরের সাথে কোন সময় খাদ্য উপকরণ মিশিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করা ঠিক নয়;
- ❖ অনেকে খাদ্য উপকরণের সাথে সার মিশিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করে থাকেন যা কোন ভাবেই উচিৎ নয়।

অধিক ফলন পেতে ৬-৭ দিন পরপর প্রতি কেজি খাদ্যে ১-২ গ্রাম ভিটামিন ও ১-২ গ্রাম লবণ এবং ফিশফিড সাপ্লিমেন্ট বা গাট-প্রোবায়োটিক ১-২ গ্রাম মিশ্রিত করে প্রয়োগ করা যেতে পারে ।

৭) মাছের উৎপাদন অধিকতর ভাল পাওয়ার জন্য করণীয় ঃ বাজারে রুই মাছের চাহিদা ও দামও বেশি সুতরাং অনেক প্রতিষ্ঠিত অগ্রসর মাছচাষিগণ মাছের বর্ধন ভাল পাবার জন্য বিশেষ করে রুই মাছের উৎপাদন বেশি করার জন্য পুকুরে তুলনা মূলকভাবে রুই মাছ বেশি মজুদ করেন এবং রুই মাছের বর্ধন দ্রুত করার জন্য নানবিধভাবে চেস্টা করে থাকেন। এ জন্য মাছচাষিরা খাবারের সাথে বাড়তি ফিড এডিটিভস (এ্যামিনোএসিড) এবং বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন প্রিমিক্স মিশিয়ে খাওয়ান যা মাছের খাদ্যের পুস্টির ভারসাম্য (Balance Feed) রক্ষা করে, খাদ্যের হজম বা পরিপাক (Digestion) তরান্বিত করে এবং খাদ্যের আত্বিকরণ (Assimilation) বাড়িয়ে খাদ্যের মাংসে রুপান্তর হার (Feed Conversion Ratio-FCR) বাড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি এ

সকল উপাকরণ মাছের খাদ্য গ্রহণের রুচি বাড়িয়ে দেয় এবং খাদ্যের পানিতে স্থায়িত্ব কালও বাড়িয়ে দেয়। প্রতিদিন না হলেও ৬-৭ দিন পরপর খাদ্যের সাথে (প্রতি কেজি খাবারে ১ গ্রাম) মিশিয়ে খাওয়ালে মাছের বর্ধন হার বৃদ্ধির পাশাপাশি মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, মাছ ভাল থাকে এবং মাছের উজ্জলতা ও বর্ণ আকর্ষণীয় হয়।

৮) সার প্রয়োগ ঃ পুকুরে প্রাকৃতিক খাবারের প্রাচুর্যতা বৃদ্ধির জন্য পুকুরে নিয়মিত জৈব-অজৈব সার প্রয়োগ করতে হয়। যে সব পুকুরে নিয়মিত খাদ্য প্রয়োগ করা হয় সে সব পুকুরে ইউরিয়া সার কম দিতে হয় এবং যে সব পুকুরে নিয়মিত ভিজা খাবার প্রয়োগ করা হয় সে সব পুকুরে সাধারণত ইউরিয়া সার প্রয়োগ না করাই ভাল কেবল টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হবে। কারণ এ সব পুকুরে মাছের পায়খানা থেকে পর্যাপ্ত নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ পদার্থ নিয়মিত পুকুরের পানিতে যুক্ত হয়। ফলে অনেক সময় নাইট্রোজেনের এ প্রাচুর্যতা পুকুরে ফাইটোপ্লাংকটনের ব্লুম ঘটিয়ে পুকুরে অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। পানি হালকা সবুজ বা হালকা বাদামী রং থাকায় ভাল। পানি গাঢ় সবুজ হলে সার দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। পুকুরের পানির রং এবং জুপ্লাংকটনের উপস্থিতি দেখে পুকুরে সার দেবার প্রয়োজন আছে কি না বুঝতে হবে।

প্রতি বিঘাতে সার প্রয়োগের পরিমাণ (কেজিতে)

উপকরণের নাম	ধরন-১	ধরন-২	ধরন-৩	ধরন-৪	ধরন-৫	ধরন-৬
সারষার খৈল (৬-৭ দিন পরপর)	৬-৭		৩-৪			**৭-৮**
ইউরিয়া (১০-১২ দিন পরপর)		২-৩		**৩-৪**		
টিএসপি (১০-১২ দিন পরপর)		৪-৫	৫-৬	**৫-৬**	**৬-৭**	
এমপি		১-২		**১-২**		

সরিষার খৈল ২৪ ঘন্টা পর্যাপ্ত পরিমাণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে পুকুরে প্রয়োগের সময় ভালভাবে গুলিয়ে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। বৃষ্টির দিনে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। টিএসপি ব্যাবহারের আগে ১০-১২ ঘন্টা ভিজিয়ে গুলিয়ে নিতে হবে, দানাদার অবস্থায় টিএসাপি সার পুকুরে ব্যবহারকরা ঠিক নয়।

সার প্রয়োগ ছাড়াও পুকুরে পর্যাপ্ত জুপ্লাংটন তৈরির জন্য আগের অধ্যায়ে বর্ণিত ইস্ট মোলাসেস পদ্ধতিও অনুসরণ করা যেতে পারে।

ঘ) মাছের চাষ নিরাপদ রাখার জন্য অন্যান্য কার্যক্রম

মাছেরচাষ নিরাপদরেখে অধিক উৎপাদন পাবার জন্য বেশ কয়েকটি কার্যক্রম গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১) নমুনায়ন ঃ মাছ বিক্রয় করার সময় ছাড়া মাছ ধরে পর্যবেক্ষন করা ঠিক নয়। মাছের খাবার প্রয়োগের সময় খাবারের প্রতি মাছের সাড়া এবং মাছের গতি প্রকৃতি পর্যক্ষেণ করে মাছের বর্ধন ও খাদ্য প্রদানের পরিমাণ নির্ণয় করায় উত্তম। মাছ ধরে নমুনাকরণ করে পুকুরের মাছকে বিরক্ত করা বা পিড়ন অবস্থায় ফেললে মাছের বর্ধনে খারাপ প্রভাব পড়ে।

২) পুকুরে চুন প্রয়োগ ঃ পুকুরের পানির পরিবেশ ভাল রাখার জন্য মাছচাষ চলাকালে প্রতিমাসে একবার বিঘা প্রতি ৫-৬ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে। পানির পিএইচ ৭.৫-৮.৫ বজায় রাখতে হবে। ক্ষারীয় পরিবেশে সারের কার্যকারিতা ভাল হয়। মাছ থাকা অবস্থায় পুকুরের পানিতে চুন ভিজান মাছের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। পুকুরে মাছ থাকা অবস্থায় সকাল ৭-৮ ঘটিকার মধ্যে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন পুকুরে প্রয়োগের ১-২ ঘন্টা আগে সিমেন্টর চাড়ি বা বড় ড্রামে পর্যাপ্ত পানি দিয়ে ভিজাতে হবে এবং পাতলা করে গুলিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। চুন অধিক সময় ধরে ভিজিয়ে রাখলে চুনের কার্যকারিতা কমে যায়। চুন প্রয়োগের আগে পুকুরের পানির পিএইচ অবশ্যই মেপে নিতে হবে। পি এইচ ৭ এর উপরে থাকলে পুকুরে চুন প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। মেঘলা দিনে পুকুরে চুন দেয়া যাবে না। চুন সব সময় সারা পুকুরে সমভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে।

ছবিঃ মাছচাষ চলা কালে পুকুরে চুন প্রয়োগ

৩) জীবণুনাশক ও প্রোবায়োটিক্স প্রয়োগ ঃ চাষের মাছ নিরাপদ রাখার জন্য ২-৩ মাস পরে বাজারে প্রাপ্ত ভাল মানের যে কোন একটি জীবাণু নাশক প্রয়োগ করতে হবে। বিশেষ করে শীতের সময় এ কাজটি অবশ্যই করতে হবে। তবে পুকুরে জীবাণুনাশক প্রয়োগ করলে পুকুরের ক্ষতিকর জীবাণুর সাথে সাথে উপকারী ব্যাক্টেরিয়াসমূহও মারা যায় এর ফলে পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের

(Ecology) ক্ষতি হয় বিশেষ করে ক্ষতিকর এ্যামোনিয়াকে উপকারি নাইট্রাইটে রুপান্তরে জড়িত ব্যাক্টেরিয়ার অনুপস্থিতি পুকুরের মাছের ক্ষতির কারণ হতে পারে। এ জন্য জীবাণুনাশক প্রয়োগের ৩-৪ দিনের মধ্যে এক ডোজ ভালমানের প্রোবায়টিক্স প্রয়োগ করতে হবে। প্রোবায়টিক্স পুকুরে দ্রুত উপকারী ব্যাক্টেরিয়ার উৎপাদন করে এবং পরিবেশের জৈব পদার্থ ব্যবহার করে পুকুরের পরিবেশ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে। প্রতিবারে পরিমাণ মত প্রোবায়োটিক বিঘাপ্রতি ৩-৪ কেজি চিটাগুড়ের সাথে একটি পাত্রে ১০-১৫ লিটার পানিতে মিশ্রিত করে ছায়াযুক্ত স্থানে ১-৩ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে তারপর পানিতে প্রয়োগ করতে হবে।

৪) **জুপ্লাংকটনের প্রাচুর্যতা কমানো ঃ** বৃহৎ পুকুরে বড় আকারের মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবিষয়টি একটি অপরিহার্য সমস্যা। চাষি বড় আকারের রুই এবং কাতল উৎপাদনের জন্য খুবই তৎপর থাকে সে জন্য পুকুরে একাধিকবার খাবার দেবার পাশাপাশি নিয়মিতভাবে সরিষার খৈল ভিজিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করে। এ ছাড়া বিশেষ করে যে সব পুকুরে ভিজা খাবার প্রদান করা হয় সে সব পুকুরে পর্যাপ্ত প্লাংকটন তৈরি হয় যা মাছে খেয়ে শেষ করতে পারেনা। এ সব অতিরিক্ত জুপ্লাংকটন মাছের ক্ষতির পাশাপাশি পুকুরের অক্সিজেনের ঘাটতিসৃষ্টি করে। এ জন্য জুপ্লাংকটনের প্রাচুর্যতা (মাখোন পোঁকা বা সুজি পোঁকা) দেখে মাঝে মধ্যে সাইফারমিথ্রিন ১০ ইসি (বিঘা প্রতি ২৫-৩০ এমএল) বা বিঘা প্রতি ডেলটামিথ্রিন ৬০-১০০ এমএল প্রয়োগ করা হয়। তবে অভিজ্ঞ চাষিরা সন্ধার পরে পুকুরের কর্ণারে জমা হওয়া প্লাংকটনের উপর ঔষধ ছিটিয়ে দেন মারার জন্য। এতে খরচ কিছুটা কম হয় এবং অধিক ঔষধ ব্যবহারপরিহার করা যায়। নিরুপায় না হলে বা সমস্যা প্রকট না হলে এ ধরনের ঔষধ পুকুরে না প্রয়োগ করাই ভাল।

৫) পুকুরে এ্যারেটর স্থাপন ঃ বিগত ২০২০ সনের সেপ্টেম্বর মাসের ১ ও ২ তারিখে রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলায় বড় মাছচাষের পুকুরে হঠাৎ করে অক্সিজেন ঘাটতি হয় এবং লক্ষ লক্ষ টাকার মাছের ক্ষতি হয়ে যায়। এ ছাড়াও মনে রাখা দরকার বড় মাছের অক্সিজেনের চাহিদা কিছুটা বেশি থাকে। এজন্য মাছ যখন বড় হয়ে যায় তখন মাছকে নিরাপদ রাখার জন্য পুকুরে এ্যারেশনের ব্যবস্থা রাখা নিরাপদ। পুকুরের অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য এ্যারেশন নানাভাবে করা যেতে পারে। প্রতিদিন পুকুরে ডিজেল মেশিন বা গভীর-অগভীর নলকূপের পানি দিয়ে পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের পর্যাপ্ততা বাড়ানো যেতে পারে অথবা বর্তমান সময়ে বাজারে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের যে এ্যারেটর মেশিন পাওয়া যাচ্ছে তা পুকুরে এক বা একাধিক স্থাপন করে মাছচাষকে অধিকতর নিরাপদ ও লাভজনক করা যেতে পারে।

ছবি ঃ স্বল্প মূল্যের ভেনচুরি এ্যারেটর

ছবি ঃ প্যাডেল হুইল এ্যারেটর

৬) মাছের রোগ ও তার প্রতিকার ঃ চাষের পুকুরে দ্রবণীয় অক্সিজেনের সংকট ছাড়াও এ ধরনের মাছচাষ পদ্ধতিতে প্রধানত কয়েকটি রোগের সমস্যা প্রায় দেখা দেয় ক) মাছের উকুন; খ) মাছের এংকর ওয়ার্ম এবং গ) শীতে ক্ষতরোগ

ক) মাছের উকুন ঃ এ ধরনের মাছচাষে সাধারণত এ সমস্যাটি বেশি হয়ে থাকে কারণ বড় পুকুরে যারা মাছচাষ করেন তাঁরা পুকুর শুকাতে পারেন না। বছরের পর বছর একইভাবে মাছচাষ করার কারণে পুকুরের তলদেশে জৈব পদার্থের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। চাষ পদ্ধতিতে ভিজা খাবার এবং সরিষার খৈল ভিজিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করা হয় এ জন্য পুকুরে পঁচনশীল জৈব পদার্থ বেশি থাকে। এ চাষ পদ্ধতিতে ৪ মাস পরে প্রতি মাসেই মাছ ধরে বিক্রয় করা হয় ফলে মাছের গায়ের শ্লাইম উঠে যায় ফলে উকুনের আক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। মাছের উকুন সাধারণত রুই মাছকে হোস্ট হিসাবে পছন্দ করে। এ জন্য পুকুরে উকুন হলে রুই মাছের বেশি ক্ষতি হয়। আক্রন্ত হলে টের পাবার সাথে সাথে পর পর তিন সপ্তাহ প্রতি বিঘাতে (৩-৪ ফুট গভীরতায়) ২০০-২৫০ এমএল সুমিথিয়ন বা এ জাতীয় ঔষধ সন্ধার সময় প্রয়োগ করতে হবে। তবে পুকুরে যাতে এ সমস্যা না হয় সেদিকে মনোযোগী হওয়া দরকার।

খ) এংকর ওয়ার্ম ঃ মাছের উকুন হওয়ার পাশাপাশি রুই মাছের আর একটি সমস্যা বেশি হয় তা হল এংকর ওয়ার্ম এটি মাছের শরীরের রক্ত চুষে নেয়। এ পরজীবীর একটি অংশ মাছের শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে সুতার মত ঝুলতে থাকে। পুকুরে বড় আকারের জুপ্লাংকটন বেশি উৎপাদিত হলে এরা মাছের শরীরে আক্রমণ করে ক্ষত সৃষ্টি করে যেখানে এংকর ওয়ার্ম আক্রমণ করে। এ রোগে আক্রান্ত হলে রুই মাছের খাদ্য গ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। অনেক সময় কাতলের ফুলকার মধ্যেও আক্রমণ করতে দেখা যায়। রুই মাছের শরীরে লাল ক্ষতের সুষ্টি হয়ে ছোপ ছোপ দাগের সুষ্টি হয়। বেশি দিন ধরে আক্রান্ত মাছে এংকর ওয়ার্মকে মাছের দেহে সুতার মত ঝুলতে দেখা যায়। মাছ দ্রুত দূর্বল হয়ে পড়ে। অন্যান্ন মাছেও এর আক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এ সমস্যার প্রতিকারে

ডেলটামিথ্রিন বা এ জাতীয় ঔষধ বিঘাতে ৬০-১০০ এমএল প্রয়োগ করতে হয় পর পর ২ সপ্তাহ। পাশাপাশি বিঘাতে ২০০ গ্রাম পটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এ সমস্যা সমাধানে তুতে ($CuSO_4$) বিঘা প্রতি ৩০০ গ্রাম প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে পুকুরে এ ধরনের ঔষধ ব্যাহার না করায় ভাল। চেস্টা করা দরকার যাতে এ ধরনের সমস্যা না হয়।

ছবি ঃ উকুনে আক্রান্ত মাছ

ছবি ঃ এংকর ওয়ার্ম আক্রান্ত মাছ

ছবি ঃ ক্ষত রোগে আক্রান্ত মাছ

ঘ) ক্ষত রোগ ঃ সাধারণত শতিের সময় মৃগেল, থাই সরপুটি, বাটা, দেশি পুটি এবং শৈল-টাকি মাছে এ রোগ দেখা দেয়। এ রোগের প্রতিরোধ করতে না পারলে অনেক মাছ মারা যেতে পারে। এ রোগ হয়ে গেলে শতকে ১ কেজি চুন ও ১ কেজি লবণ প্রয়োগ করতে হয়। পাশাপাশি পাটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট শতকে ৫-৮ গ্রাম প্রয়োগ করা যেতে পারে। মাছ থাকা অবস্থায় পুকুরে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা ঠিক নয়। সমস্ত চুন দুভাগে ভাগ করে মাঝে একদিন বিরতী দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। তবে প্রতিরোধেকল্পে শীতের শুরুতে শতকে ১ কেজি (৫ ফুট গভীরতায়) হারে চুন প্রয়োগ করলে এ রোগ আর দেখা দেয় না।

আংশিক আহরণ ও পুনঃমজুদ

বড় আকারের মাছ উৎপাদনে মাছের আহরণ বিষয়টি একেক চাষি একেকভাবে করে থাকেন। কারো উদ্দেশ্য থাকে কিছু খরচ বের করা আবার কারো লক্ষ্য থাকে মাছকে অধিকতর বড় হওয়ার জন্য পুকুরের জীবভর কমিয়ে দেয়া। সাধারণত চাষের সময় ৪ মাস পর হতে আংশিক আহরণ শুরু হয় এবং আহরণ উপযোগী মাছের আকার বুঝে প্রতি মাসেই মাছ আহরণ করে হয়। যারা অধিকতর বড় আকারের মাছ উৎপাদনের জন্য আংশিক আহরণ করেন তাঁরা ব্যতিত অন্যরা ধৃত মাছের পরিমাণ বুঝে আবার সমপরিমাণ বড় আকারের প্রজাতি ভিত্তিক পোনা মজুদ করে উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখেন।

১) আহরণ ও জীবন্ত মাছ বাজারজাতকরণ ঃ মাছের ওজন ও দর কাঙ্খিত হলে মাছ আহরণ করা হয় এবং তা জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা হয়। জীবন্ত মাছ বিপণন অধিক লাভজনক এবং অন্তত ১০% বেশি দামে বিক্রয় হয়। ভোক্তা পর্যায়ে তাজা ও জীবন্ত পঁচনমুক্ত এবং স্বাস্থ্যসম্মত এ মাছের চাহিদা অনেক বেশি। উপরের আলোচিত পদ্ধতিতে মাছচাষ করা হলে বছরে প্রতি শতাংশে প্রায় ২০-২৫ কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

২) আয় ব্যয়ের হিসাব ঃ এক একর জলায়তন একটি পুকুরে

ক্র. নং	খরচের খাত	একক মূল্য	মোট মূল্য
১	পুকুর ভাড়া		১০০০০০
২	মৎস্য নাশক প্রয়োগ		৫০০০
৩	পুকুর প্রস্তুতি (চুন, সার ও অন্যান্য)		১৫০০০
৪	পোনা ক্রয় ১০০০টি গড় ওজন ৫০০ গ্রাম	৭৫	৭৫০০০
৫	খাদ্য ৯০০০ কেজি	৩৫	১০৫০০০
৬	ঔষধ, শ্রমিক মজুরী ও অন্যান্য		২০০০০
৭	মাছ ধরা বাজারজাতকরণ		১৫০০০
সর্বমোট খরচ			৩,৩৫,০০০/-

মোট মাছ উৎপাদন (গড় ওজন ২.৫ কেজি ধরে ১০০০ x ২.৫) = ২৫০০ কেজি

মোট আয় ২৫০০ কেজি @ ২৫০/- = ৬,২৫,০০০/- টাকা

নীট লাভ (৬,২৫,০০০/- - ৩,৩৫,০০০/-) = ২,৯০,০০০/- টাকা

যে সকল চাষিগণ কার্প মিশ্রচাষের সাথে কিছু ফলি বা চিতল মাছ মজুদ করবেন তাঁরা দামি এ মাছের একটি বাড়তি মুনাফা অর্জন করতে পারবেন। বর্তমান সময়ে বাজারে যে চিতল বা ফলি মাছ পাওয়া যায় তার মূখ্য অংশ এই বড় মাছের পুকুরে একই সাথে উৎপাদিত হয়। বড় মাছের প্রতি গাড়িতে কার্প জাতীয় বড় মাছের সাথে ৩০-৪০ কেজি এ ধরনের মাছ জিবন্ত অবস্থায় বাজারে নেয়া হয়। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ্য যে বর্তমান অনেকে চাষি এ মিশ্রচাষ পদ্ধতির সাথে গুলশা, পাবদা ও ট্যাংরা মাছ মজুদ করে বাড়তি উৎপাদন ঘরে তুলছেন। সেক্ষেত্রে চিতল বা ফলি মাছ মজুদ করা নিরাপদ হবে না।